আমাদের দাওয়াত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস

www.chhatra-majlis.org.bd

আমাদের দাওয়াত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস

আমাদের দাওয়াত

৭ম সংস্করণ ও প্রকাশ
রমজান-১৪৪৩
বৈশাখ-১৪২৯
ফেব্রুয়ারি-২০২২

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস
কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০১৭১১-৩১৮৩২৭
মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র
Website: www.chhatra-majlis.org.bd

Amader Dawat (Our Approach)
Published by Bangladesh Islami Chhatra Majlis
Central Office: 2/2, Purana Paltan, Dhaka-1000.
Phone: 01711-318327,
Price: 10.00 Only

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর পরিচয় ও
তাওহীদের মর্মকথা

আমাদের চোখের সামনে এই যে বিরাট পৃথিবী, গাছ-পালা, তরু-লতা, জীব-জন্তু, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুল এবং চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এসবের দিকে যদি আমরা একটু চোখ মেলে তাকাই, তাহলে কী দেখতে পাই? সমগ্র সৃষ্টিজগৎ জুড়ে এক সুন্দর নিয়মের রাজত্ব বিরাজ করছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টবস্তু এক অপরিবর্তনীয় বিধান মেনে চলছে। নির্দিষ্ট গতিতে পৃথিবী তার কক্ষপথ অতিক্রম করে চলছে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হচ্ছে, ঋতুচক্রের পালাবদল ঘটছে-কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই। পানি, বাতাস, তাপ ও আলো-এসব কিছুও কাজ করে যাচ্ছে এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে। গাছপালার রাজ্যেও রয়েছে নিজস্ব নিয়ম। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী মানুষও জন্মগ্রহণ করে, বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে। তার মস্তিষ্ক,

পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে সেই একই পদ্ধতিতে, একই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে।

এই দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছুই যে শক্তিশালী বিধান ও নিয়মের অধীনে চালিত হচ্ছে, সেই বিধানের নিয়ন্ত্রণকারী স্বয়ংক্রিয় সত্তা তিনি, যার ইচ্ছা ও আদেশ নিরংকুশ আসমান ও জমিনের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, যার হাতে রয়েছে জীবন-মৃত্যুর বাগডোর ও জীবিকার চাবিকাঠি; সেই মহাবিজ্ঞানময় ও সার্বভৌম সত্তাই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।

আসলে আল্লাহপাকের অস্তিত্ব ও তাঁর বিশাল ক্ষমতা-এখতিয়ার প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর তা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করার বিষয়ও নয়। নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, এর স্থিতি, ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি সবকিছুই তাঁর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতার জীবন্ত সাক্ষী। আমাদের জীবন ও জগতের প্রতিটি পরতেই ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য করুণার উজ্জ্বল নিদর্শন। আমাদের সচেতন মন ও অনুভূতি তাঁকে উপলব্ধি করে। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত, আহারের প্রতিটি দানা থেকে শুরু করে যাবতীয় আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং ভাঙা-গড়ার প্রতিটি অধ্যায়; সেই সুমহান সত্তার অস্তিত্বের সপক্ষে কথা বলে।

তাইতো দেখি, ইদানীং গুটিকয়েক অর্থোন্মাদ ও ধর্মবিদ্বেষী ছাড়া কী বর্তমান, কী অতীত কোনোকালেই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কেউ দেয়নি। আমরা যাদেরকে খোদাদ্রোহীদের গুরু বলে জানি সেই ফেরাউন, নমরূদ এবং শাদ্দাদও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তাদের আপত্তি ছিল কেবল আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানতে অর্থাৎ দুনিয়ার কর্তৃত্ব পরিচালনায় তারা আল্লাহকে বেদখল করতে চেয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব পরিচালনায় আল্লাহর ক্ষমতা-এখতিয়ার ও প্রভুত্বকে মেনে নিতে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। তারা মনে করতো যে, আল্লাহপাক নিছক স্রষ্টা। দুনিয়া জাহান সৃষ্টি করার পর আল্লাহর কাজ মোটামুটি শেষ (নাউজুবিল্লাহ)।

কাজেই এই দুনিয়ার পরিচালনা, এখানকার আইন-কানুন প্রণয়ন এবং শাসনকার্যের ব্যাপারে আল্লাহর আর কোনো ভূমিকা নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহপাকের দৃষ্টিতে এটাই ছিল তাদের মস্ত বড় অপরাধ। কেননা, দুনিয়ার শাসনকার্য থেকে আল্লাহকে দূরে রাখার মাধ্যমে তারা মানুষের উপর নিজেদের মিথ্যা প্রভুত্বের জোয়াল চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং এভাবে আপন ইচ্ছা, খেয়াল-খুশি ও অহংকার চরিতার্থ করতে চাইতো। 'ইনিল হুকমু ইল্লা-লিল্লাহ (সূরা ইউসুফ-৪০)' অর্থাৎ আল্লাহর এই জমিনে কেবল আল্লাহরই আইন চলবে-আল্লাহপাকের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ জানার পরও তারা শুধু একজন্যই বিরোধিতা করেছিলো যে, আল্লাহর আইন জারি হয়ে গেলে অন্যায় ও অসংগত উপায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষকে ইচ্ছেমত শাসন ও শোষণ করার সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধুনিককালে পাশ্চাত্যে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার (ঝবপঁষধৎরংস) যে ধারণা চালু রয়েছে যার মূলকথা হচ্ছে, ধর্ম নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্মের কোনো বিধান প্রয়োগ করা চলবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের আওতামুক্ত রাখতে হবে। এটা সেই পুরনো ফেরাউনী ও নমরূদী চিন্তাধারারই আধুনিক সংস্করণ। ধর্মনিরপেক্ষতার ন্যায় একটি আপাতঃ সুন্দর লেবেল লাগিয়ে আধুনিককালের কতিপয় ধূর্ত রাষ্ট্রনীতিবিদ

সেই পুরনো দর্শনই একটু ঘুরিয়ে আবার নতুন করে চালু করেছে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে নতুন বোতলে সেই পুরাতন মদ। ধর্মনিরপেক্ষতার এ দর্শন ইসলামের তাওহীদ এর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উলুহিয়্যাত (বন্দনা/উপাসনা পাওয়ার একমাত্র সত্তা) এবং রবুবিয়্যাতকেই (সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র সত্তা) অস্বীকার করা হয়। তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, তাঁর রবুবিয়্যাত এক অবিভাজ্য সত্তা। আল্লাহ কেবল স্রষ্টা বা খালেকই নন, তিনি আসমান জমিন এবং তার মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক, বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, তিনিই একমাত্র পথ প্রদর্শক, আইন প্রণেতা, আদেশ-নিষেধের অধিকারী, সকল প্রকার আনুগত্যের একমাত্র হকদার। সুতরাং জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তার এক অংশকে ধর্মীয় জীবন আখ্যায়িত করে

কেবল এ অংশেই আল্লাহর বিধান পালন করা আর বাকি অংশ যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এ সব ক্ষেত্রকে বৈষয়িক জীবন আখ্যা দিয়ে সেখানে আল্লাহর বিধানে পরিবর্তে নিজের মনগড়া কিংবা অন্য মানুষের তৈরী বিধান চালু করা অথবা অনুসরণ করার কোনো সুযোগ তাওহীদে নেই।

যে কালিমার উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনে এবং ঘোষণা দিয়ে মানুষ ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করে, যে কালিমার মাধ্যমে কুফর এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় তার প্রথম কথাও এই তাওহীদেরই সুস্পষ্ট ঘোষণা- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে ইলাহ' অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির বন্দনা, উপাসনা এবং আনুগত্য পাওয়ার একচ্ছত্র হকদার হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ একজন আছেন মস্তিষ্কের এককোণায় কেবল এই ধারণাটুকু রাখার নামই ঈমান নয় বরং আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব-কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে- আমি কারো শাসন মানি না, বিধান মানি না, এক আল্লাহ ছাড়া। আমি কেবল তাঁরই বান্দাহ, সুতরাং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে কেবল তাঁরই আইন ও কর্তৃত্ব মেনে নেবো অন্য কারো নয়। এক আল্লাহ ছাড়া বিশ্বভুবনের আর সবকিছুর বিরুদ্ধে আমি স্পষ্টভাবে বিদ্রোহী, সবকিছু থেকে আমি স্বতন্ত্র, নির্ভীক ও আপসহীন- এ প্রত্যয় ও অঙ্গীকারই ব্যক্ত করা হয় তাওহীদের উপর্যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে। তাওহীদের ঘোষণা তাই সাধারণ কোনো ঘোষণা নয়। এ ঘোষণা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিপ্লবী ঘোষণা। আর বুঝে শুনে ঘোষণা দিলে এ কালিমাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে।

মোটকথা কালেমা তাইয়্যেবার স্পিরিট এটাই যে, এ ঘোষণার মাধ্যমে একজন মানুষের নিজের জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। তার চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, তার পছন্দ-অপছন্দ এবং আনুগত্যের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাওহীদের জীবন বেপরোয়া, লাগামহীন তথা খেয়ালখুশির জীবন নয়। এ জীবন আনুগত্যের জীবন, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের জীবন।

সৃষ্টিজগতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা

সৃষ্টিজগতে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দু'টো দিক। একদিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব-জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে মেনে চলতেই হয় সে নিয়ম। অপরদিকে মানুষের রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা করে বুঝে শুনে কোনো কিছু গ্রহণ করা বা না করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা। তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা। এদিক দিয়ে মানুষ দুনিয়ায় অন্যান্য পদার্থের মতো নয় বরং তাকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।

কিন্তু মানুষ শুধু আশরাফুল মাখলুকাতই নয়। এ দুনিয়ার মানুষের সত্যিকার অবস্থান হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দাহ ও খলিফা। বান্দাহ হিসেবে মানুষের কাজ হলো সে কেবল তার প্রভু আল্লাহরই নির্দেশ মেনে চলবে। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল সেই মহাপ্রভুর দাসত্বেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। আর খলিফা বলা হয় প্রতিনিধিকে। সুতরাং প্রতিনিধি হিসেবেও তার কাজ হলো সে যার প্রতিনিধি, তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী তার সমস্ত কাজ পরিচালনা করবে। বস্তুত এক মহান এবং বিরাট উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। মানুষ তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে এই দুনিয়াকে আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর জন্য কতটুকু চেষ্টা-সাধনা চালায়, আল্লাহর নাফরমানি এবং অবাধ্যতার সুযোগ-স্বাধীনতা থাকার পরও মানুষ তা থেকে কতটুকু বিরত থাকে তারই পরীক্ষা নেবেন আল্লাহতায়ালা।

দুনিয়ার জীবন তাই মূলত পরীক্ষার জীবন। প্রত্যেকটি মানুষ এখানে এক একজন পরীক্ষার্থীও বটে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে অর্থাৎ এই দুনিয়ার জীবনের অবসান হলে প্রত্যেককেই উপস্থিত হতে হবে প্রতিফল দিবসের ময়দানে, ইয়াওমুল হাশরে। মহাবিচারক আল্লাহপাক সেদিন প্রতিটি মানুষের জীবনের কর্মফল ঘোষণা করবেন সেদিন যারা নেক আমলকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন-তারাই হবেন প্রকৃত সফলকাম এবং চিরশান্তির আবাস জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করবেন তারাই। আল্লাহর দিদার লাভ করে তারা হবেন ধন্য। আল্লাহপাক স্বয়ং সেদিন সকল জান্নাত লাভকারীর

উদ্দেশ্যে সালাম দেবেন এবং অনন্ত নেয়ামত ঢেলে দেবেন। অপরদিকে সেদিন যারা বিদ্রোহী অথবা সীমালজ্ঘনকারী বদকার বলে চিহ্নিত হবে, জাহান্নামের দাউ দাউ করা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আগুনেই হবে তাদের ঠাঁই। আল্লাহর এই ফয়সালাকে চ্যালেঞ্জ করা দূরে থাকুক, সামান্য প্রশ্ন তোলার মতো শক্তি, যোগ্যতা ও সাহস কারো হবে না। প্রকৃতপক্ষে এক কল্পনাতীত অসহায়ত্ব ও অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সকলকেই সেদিন এই ফয়সালা মেনে নিতে হবে।

আখিরাতের জীবন

আখিরাতের জীবন-সে এক অনন্ত জীবন; যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সে জীবনে সবাইকে প্রবেশ করতে হবে- কেউই বাদ যাবে না। জাহান্নামীদের জন্যে রয়েছে সেখানে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর লাঞ্ছনার জীবন। কোরআন পাক ও হাদিস শরিফে সে জীবনের যে লোমহর্ষক চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে তার সামান্য দু'একটা উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে।

সূরা আর রহমানে আল্লাহ বলেছেন- কিয়ামতের দিন পাপীদের মুখ দেখেই চেনা যাবে। তাদের মাথার চুল ও পা দুটো ধরে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে- এটা সেই জাহান্নাম যা তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো। (আয়াত: ৪১ ও ৪৩)

সূরা আল হজ্বে বলা হয়েছে- জাহান্নামীদের অগ্নিবস্ত্র পরিধান করানো হবে। তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি। ফলে তাদের চামড়া এবং উদরস্থ সবকিছু গলে বের হয়ে আসবে। তাদের জন্য আরো নির্ধারিত থাকবে লৌহদণ্ড। অসহ্য কষ্ট ও যন্ত্রণার দরুন তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে পুণরায় তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে আগুনের স্বাদ গ্রহণ করো। (আয়াত: ১৯-২২)

সূরা দুখানে বর্ণিত হয়েছে- নিশ্চয়ই গুনাহগারদের জন্য খাদ্য হবে গলিত তামার ন্যায় জাকুম বৃক্ষ, যা পেটের ভেতর উত্তপ্ত পানির মত্যে টগবগ করতে থাকবে। (আয়াত: ৪৩-৪৬)

এই জাক্কুম বৃক্ষের বর্ণনা সূরা ছাফাতে এভাবে দেয়া হয়েছে- নিশ্চই জাক্কুম এমন একটি বৃক্ষ, যার উৎপত্তি দোজখের তলদেশ হতে, আর তার উপরিভাগ ঠিক যেন সাপের ফণা। (আয়াত: ৬৪-৬৫)

সূরা ইব্রাহীমে বর্ণিত হয়েছে- দোজখবাসীদেরকে পুঁজবিগলিত পানি পান করানো হবে যা সে গোগ্রাসে গিলতে থাকবে এবং ভীষণ কষ্টেই তা পেটের ভিতর প্রবেশ করবে। আর চারদিক হতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে ঘিরে ফেলবে অথচ তার কোনো মৃত্যু হবে না। (আয়াত: ১৬-১৭)

সূরা কাহফে আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন- যখন তারা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ছটফট করবে ও পানির জন্যে আর্তনাদ করতে থাকবে, তখন তাদেরকে তৈলের গাদের মতো বিশ্রী পানি দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। (আয়াত: ২৯)

সূরা নিসার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে- যখন তাদের শরীরের চামড়াসমূহ জ্বলে খসে পড়বে তখনই আবার তদস্থলে নতুন চামড়া তৈরি করে দেয়া হবে, এতে তারা বারংবার শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে। (আয়াত: ৫৬)

এই হচ্ছে আখিরাতে শাস্তির অতি সামান্য কিছু বিবরণ। এ লোমহর্ষক বর্ণনা শুনলে শরীর কার না শিউরে উঠে। সত্যি বলতে কী, গভীর ও নির্জন রাতে আমরা যদি কখনো কবরের ঘোর অন্ধকার ও একাকিত্ব কল্পনা করার চেষ্টা করি-ভয়ে আমাদের চোখ বুজে আসে। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে পীচঢালা রাস্তার উপর দিয়ে চলার মুহূর্তে আমরা যখন ইয়াওমুল হাশরের দাবদাহের একটা অসম্ভব ও অবাস্তব তুলনাও করার চেষ্টা করি, তখনও আমরা যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলি। ভয়ে আমাদের পেশীগুলো নিস্তেজ হয়ে আসে। প্রচণ্ড তাপ উৎপাদনকারী কোনো চুল্লীর লেলিহান শিখার দিকে

তাকিয়ে যখন আমরা এর চেয়ে কোটিগুণ বেশি উত্তপ্ত দোযখের কথা কল্পনা করার চেষ্টা করি তখন মনে হয় যেন নিমিষেই আমরা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলি-অসাড় হয়ে যাই। জীবনের গোপন প্রতিটি গুনাহ যেন এক একটি শিখা হয়ে আমাদের অস্তিত্বকে গ্রাস করতে চায়। আর তখন অনুভূতির সবটুকু জুড়ে শুধু একটি সুরই অনুরণিত হয়। সে সুর ঈমানের আলোকে জীবন গড়ার, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, সকল আকর্ষণ থেকে হৃদয় বাঁচিয়ে কেবল আল্লাহমুখী করার।

এরপরও চূড়ান্তভাবে একথা সত্য যে, কোরআন পাক ও হাদিস শরীফে আখিরাতের যে ভয়াবহ ও হৃদয় কাঁপানো চিত্র সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, দুনিয়ার কোনো কিছুই তার তুল্য হতে পারে না। বড়জোর বিভিন্ন উপকরণ ও অবস্থার মাধ্যমে তার কিছুটা অনুভব করার চেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র। ঠিক একইভাবে জান্নাতের অনন্ত ও অতুলনীয় সুখ এবং শান্তির যে রূপ আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূল সা.-এর বাণীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, দুনিয়ার কোনো উপকরণই তার প্রতিরূপ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অসংখ্য আয়াতের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

যেমন- সূরা বাকারায় আল্লাহপাক বলেছেন- যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তদনুসারে নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যেগুলোর তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। এসব বাগিচার ফল বাহ্যত দেখতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতোই হবে। যখনই কোনো ফল তাদের খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলে উঠবে; এ ধরনের ফলই পৃথিবীতে আমাদেরকে ইতঃপূর্বে দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র সংগী (স্বামী-স্ত্রী অর্থে) থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (আয়াত: ২৫)

সূরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে- দুনিয়ার রাজ্যসমূহে আল্লাহর নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে। এটা কয়েকদিনের জীবনের স্বল্প আনন্দ সামগ্রী মাত্র। অতঃপর এরা সকলেই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। আর এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থান। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে,

তাদের জন্যে এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর নিকট হতে মেহমানদারির এই সরঞ্জাম তাদের জন্য। আর আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে নেক লোকদের পক্ষে তাই উত্তম জিনিস। (আয়াত: ১৯৬-১৯৮)

সূরা আল-ইনসান (আদ দাহরে) বর্ণিত হয়েছে- নেককার লোকেরা জান্নাতের সুরার এমন সব পাত্র পান করবে যার সাথে কপূর পানির সংমিশ্রণ হবে। এটা একটি প্রবহমান ঝর্ণা হবে, যার পানির সংগে আল্লাহর বান্দারা শরাব পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে। আল্লাহ তাদেরকে সজীবতা, আনন্দ ও সুখ দান করবেন। দেবেন উদ্যান ও রেশমী পোশাক। তথায় তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে, না শীতের প্রকোপ। জান্নাতের ছায়া তাদের উপর অবনত হয়ে থাকবে এবং এর ফলসমূহ সর্বদা তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে। তাদের সম্মুখে রৌপ্যনির্মিত পাত্র ও কাচের পেয়ালা আবর্তিত হবে। সেই কাঁচ যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মতো ভর্তি করে রাখবে। তাদেরকে তথায় এমন সুরা-পাত্র পান করানো হবে যাতে শুন্ঠির সংমিশ্রণ থাকবে। এটা হবে জান্নাতের একটা নির্ঝর, একে সালসাবিল বলা হয়। তাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তথায় যেদিকেই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নিয়ামত আর নিয়ামতই এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম দেখতে পাবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদের রব তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। এটাই হলো তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবানরূপে গৃহীত হয়েছে। (আয়াত: ৫-২২)

আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণ টেনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. জান্নাত ও জাহান্নামের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা একজন সচেতন ও হৃদয়বান মানুষকে আলোড়িত না করে পারে না।

বস্তুত জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এতো সব নিয়ামত রেখেছেন যা বর্ণনাতীত ও তুলনাতীত। আমাদের উপলব্ধির জন্যে তাই এতোটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো চোখ তা দেখেনি- কোনো কান তা শোনেনি- কোনো হৃদয় তা উপলব্ধি করেনি।

নবী-রাসূল আ. দের
আগমন ও তাঁদের মিশন

দুনিয়ার বুকে মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা বার্তাবাহক বা নবী প্রেরণ করেছেন। খেলাফতের যে মহান দায়িত্বে আল্লাহপাক মানুষকে অভিষিক্ত করেছেন সে দায়িত্ব মানুষ কীভাবে আঞ্জাম দেবে, কীভাবে সে দুনিয়ার জীবনের এ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কীসে তার কল্যাণ আর কীসে তার অকল্যাণ এ মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ ও পদ্ধতি বলে দিয়েছেন আল্লাহর মনোনীত এসব নবী-রাসূলগণ। আল্লাহপাক নিজেই বলেন- আমি পয়গম্বরদেরকে সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি-যাতে তাদের পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর ওপর কোনো দোষারোপ করার সুযোগ না পায়। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মাহাবিজ্ঞানময়। (সূরা নিসা: ১৬৫)

দুনিয়াতে লক্ষাধিক নবী-রাসূল আগমন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়নীতি ও চরিত্রের আধার। চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন প্রত্যেকেই। সকলে একই মিশন, একই দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন। সকল প্রকার মিথ্যা খোদার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করে কেবল এক 'লা-শারীক' আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করার জন্য তাঁরা মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দুনিয়ার বুকে মানুষের উপর মানুষের এবং অন্যান্যের প্রভুত্বকে উৎখাত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এসব নবী-রাসূল আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন প্রচণ্ডভাবে।

সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি ও আইন-কানুনের ধারক-বাহক যারা ছিল, যারা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আসীন কিংবা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের উপর কর্তৃত্বশীল, যারা মানুষের উপর নিজেদের মনগড়া বিধান চাপিয়ে রেখেছিল; সেই কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকেই এসেছিল বাধা। কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকরা মহান জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশ্বমানবতার গৌরব এসব নবী-রাসূলকে শুধু বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু তাঁদের উপর অমানষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল। এরা নবীদের কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, কাউকে জেলে পুরেছে, কারো দেহ করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং কাউকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এতো সব নির্যাতনের পরেও নবী-রাসূলগণ তাঁদের মিশন নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। পারিপার্শ্বিকতার দিক থেকে চরম-নাজুক অবস্থায়ও তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরে দাঁড়াননি। এই নবুওয়্যাতী ধারারই সর্বশেষ স্তম্ভ হচ্ছেন, আমাদের প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ দিশারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা স.। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানির অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি এবং তাঁর মহান সাহাবীগণ। দুনিয়ার বুকে প্রচলিত সকল বাতিল ধর্ম, মতবাদ এবং জীবন-বিধানের উপর সত্য-দ্বীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈসায়ী সপ্তম শতাব্দীতে তাওহীদের ভিত্তিতে তিনি সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন যা ছিল ন্যায়, শান্তিও সাম্যে ভরপুর! আল্লাহর বিধানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, শোষণ ও জুলুমের পুরোপুরি মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রমাণ করে গেছেন আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব। পরিষ্কারভাবে বিশ্বমানবতাকে তিনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতে মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ হলো আল-ইসলাম।

নবুওয়্যাতী ধারার অবসান ও উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব-কর্তব্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত মুহাম্মদ স. হচ্ছেন নবুওয়্যাতী ধারার সর্বশেষ স্তম্ভ অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন শেষ নবী। কোরআনে তাঁকে বলা হয়েছে-খাতামুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। (সূরা আহযাব-৪০)

সুতরাং আজকে বিশ্বমানবতার সামনে সত্য বিধান আল-ইসলামকে তুলে ধরার দাযিত্ব এসে পড়েছে নবী মুহাম্মদ স.-এর অনুসারী তথা উম্মতে মুহাম্মদীর কাঁধে। উম্মতে মুহাম্মদীর এ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহপাক কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন- আমি তোমাদেরকে এক শ্রেষ্ঠ ও মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে করে তোমরা দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হও, আর রাসূলও হন তোমাদের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা। (সূরা বাকারা-১৪৩)

তারপর কোরআনেই আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে এ দায়িত্ব পালন না করার কঠিন পরিণতির কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা বাকারায় তিনি বলেছেন- যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে অথচ সে যদি তা গোপন করে রাখে তবে তার চাইতে বড় জালিম আর কে হতে পারে? (আয়াত: ১৪১)

মোটকথা, এ দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকা কোনো মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহর কিতাব ও নবী স.-এর যে আদর্শ (সুন্নাহ) মুসলমানের কাছে আমানত রয়েছে তাকে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে বিশ্বমানবতার সামনে। নিজেদের চিন্তা, বিশ্বাস, কথাবার্তা, চরিত্র, আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন-আদালত, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানবীয় বিষয়াদির অন্যান্য সমস্ত দিক ও বিভাগে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল স.-এর আদর্শকেই মুসলমানদেরকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যাতে করে দুনিয়ার মানুষ এ সত্যকে জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং অনুসরণ করতে পারে।

উম্মতের গাফলতি ও
আজকের বিপর্যস্ত অবস্থা

উপরে যে দ্বীনে হক্বের সাক্ষ্যদানের কথা বলা হয়েছে মুসলিম হিসেবে আমাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এই সাক্ষ্যদান করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আজ যদি আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে কী দেখতে পাই? কীসের সাক্ষ্য আমরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে দিয়ে চলছি? চিন্তাধারার দিক থেকে আজকে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই পাশ্চাত্যের অন্ধ দাসে পরিণত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের মগজ দিয়েই তারা চিন্তা করেন এবং পাশ্চাত্যের চোখ দিয়েই তারা দুনিয়াকে দেখেন। কোনো কিছু গ্রহণ-বর্জনের জন্য তারা খুঁজে দেখেন না আল্লাহর কোরআন কী বলে এবং রাসূলের স. সুন্নাহ কী বলে। বরং তারা অনুসন্ধান করেন পাশ্চাত্যের প্রভুদের মতামত ও সিদ্ধান্ত কী! পাশ্চাত্যের প্রভুরা যাকে ঠিক বলে, চোখ-কান বন্ধ করে তাকেই তারা ঠিক বলে চিল্লাতে থাকেন, আর তারা যাকে বেঠিক বলেন তারাও তাকেই বেঠিক বলে চালিয়ে দেন, হোক না তা একেবারে বাস্তব সত্যের বিপরীত। এই মানসিকতার ফলে তারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে পর্যন্ত ওদের মতো করে ঢেলে সাজাচ্ছে। ওরা যেমন নিজেদের ধর্মকে বাস্তব জীবনের জন্যে অনুপযোগী মনে করে এ সম্পর্কে পড়াশুনার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না; তেমনি মুসলমানরাও ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করা এবং এর মৌলিক দিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত অবহিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছে না। বরং কাফেরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে অগ্রাধিকার দান করছে এবং তাকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করছে।

বস্তুত আজকে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির দিক দিয়ে মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রেই যেমন ইসলামের বিপরীত সাক্ষ্যদান করে চলছে, তেমনি নিজেদের আমলী জিন্দেগীতে ইসলামের মৌলিক দিকগুলো পালন করার ক্ষেত্রেও চরম গাফলতি প্রদর্শন করে চলছে। নামাযের কথাই ধরা যাক, আজকে মুসলমানদের যে কোনো এলাকায় গেলে দেখা যাবে সেখানে মসজিদ থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান হচ্ছে। কিন্তু

মুয়াজ্জিন কাকে ডাকছে, কীসের জন্যে ডাকছে, বহু মুসলমাদের মধ্যে এ অনুভূতিই নেই। নামাযের সময় আসে, আবার চলে যায়, কিন্তু একটি নগণ্য দল ছাড়া মুসলমানদের বাকি সবাই এ ব্যাপারে চরম উদাসীন। প্রতি বছর রমযান মাস আসে; কিন্তু এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ মাস বহু মুসলমান পরিবারে এই চেতনাটুকু পর্যন্ত দেখা যায় না। এ সময় বহু মুসলমান প্রকাশ্যে পানাহার করে এবং এই রোযা না রাখার দরুন বিন্দু পরিমাণ লজ্জাও অনুভব করে না। বরং উল্টো রোযাদার লোকদেরকেই তারা শরমিন্দা করার অপচেষ্টা করে। এদিকে যারা রোযা পালন করেন তাদের মধ্যেও খুব কম লোকই পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সহকারে পালন করে থাকে। বরং কেউ শুধু প্রথা হিসেবে পালন করে, কেউবা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ভেবে পালন করে, আবার কেউ রোযা রেখে আল্লাহ ও রাসূল স. কর্তৃক নিষিদ্ধ সব কিছুই করে যায়। যাকাত ও হজ্বের অবস্থা এর চাইতেও নিম্নমানের। যথাযথ উপস্থাপনা ও কার্যকর প্রয়োগ না হওয়ায় মহাকল্যাণের উৎস ইসলামের এসব মৌলিক ইবাদত আজকে সমাজ জীবনে কোনো কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারছে না। ফলে এসবের প্রতি অনীহা এবং ভুল ধারণা সৃষ্টির পরিবেশই শুধু তৈরী হচ্ছে।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আরো দুঃখজনক এবং চরম বেদনাদায়ক। উদ্দেশ্যহীন বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোতে পুরোদমে চালু রয়েছে। ফলে এখান থেকে মুসলমান তৈরি না হয়ে নাস্তিক, আধা-নাস্তিক এবং বস্তুবাদী মানসিকতাসম্পন্ন লোকই তৈরি হচ্ছে। এসব দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাস্তিকতা ও বস্তুবাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে প্রগতিশীল (?) বলে গণ্য করা হয় আর ইসলামী ভাবধারাকে বলা হয় মৌলবাদ, জঙ্গী, প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল। অধ:পতন আর কাকে বলে?

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চলছে আজ চরম নোংরামি ও নৈরাজ্য। পর্নোগ্রাফি, নগ্নচিত্র সম্বলিত ম্যাগাজিন-পত্রিকা-পোস্টার-বিজ্ঞাপন, অশ্লীল ও চটি সাহিত্য, কুরুচিপূর্ণ নাটক, ছায়াছবি, ডিসকো নাচের অনুষ্ঠান, ফ্যাশন ও রিয়েলিটি শো, যৌন উত্তেজক নেশা ও মদ-জুয়া ইত্যাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপাদান। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে নগ্নতা, নির্লজ্জতা ও

বেহায়াপনার দিক থেকে মুসলমান পরিবারের মহিলা ও মেয়েরা ইউরোপীয় ফিরিংগী মহিলাদেরকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে। এদের যে কোনো দ্বীন আছে, ধর্ম আছে একথা মনে করার মোটেই সুযোগ নেই আজ।

মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশের মধ্যে আজকে যারা ক্ষমতাসীন তাদের কোনো সত্যিকার আদর্শ নেই, ইসলামী চরিত্র নেই। সত্যি বলতে কী, এরাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য! মুখরোচক বুলি হিসেবে এরা ইসলামের কথা বারবার বললেও জাহিলিয়াত আর জুলুমতন্ত্রই হচ্ছে এদের একমাত্র আদর্শ। তাইতো দেখা যায় এদের কোনোটিতে সামরিক স্বৈরতন্ত্র, কোনটিতে রাজতন্ত্র, কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা, কোথাও সমাজতন্ত্র, কোথাও পুঁজিবাদ এবং কোথাও বা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে হঠাৎ তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তেল বিক্রির অর্থ দ্বারা সে সেব দেশের অধিকাংশেই চলছে ভোগ-বিলাসের মত্ততা। মদের বোতল আর আনুষঙ্গিক অপকর্মে ডুবে থেকে সে সব দেশের শেখ সাহেবরা ভুলতে বসেছেন তাদের জীবনের আসল সত্তা পর্যন্ত। ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে আঁতাত ও বন্ধুত্ব করে তারা সাম্রাজ্যবাদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে কাজ করছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই। নিজেদের দেশে এরা ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে রেখেছেন। তারপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের ইংগিতে অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলনকেও স্তব্ধ করার জন্য এ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করছেন। ইসলামের কৃত্রিম দরদী সেজে এরা বর্তমানে অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলনকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করছেন যাতে করে সেসব দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের আসল চেতনা তথা ত্যাগ ও কোরবানির চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এবং সুবিধাবাদী ও দুনিয়াবী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এভাবে তারা বর্তমান বিশ্বে সৃষ্ট ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অন্যদিকে সম্প্রতি কিছু দেশে ইসলামী রেঁনেসার সূচনা হলেও সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে তাও স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

এই হচ্ছে আজকে মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থার কিছু চিত্র। মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের মধ্যে বিরাজমান আদর্শহীনতা, ঔদাসীন্য, সত্য গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান, সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি, বস্তুবাদী ও দুনিয়াবী মানসিকতা তাদেরকে এক ভীষণ পরিণতির সম্মুখীন করেছে। বিশ্বে ৫০টিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্র এবং দেড়শ' কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও আজকে তারা ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসী থাবার সামনে নেতিয়ে পড়ছে। ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের সংকট মুসলমানদের সামনে সে প্রশ্নই তুলে ধরেছে।

বস্তুত যখন কোনো জাতি খোদার কোনো নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং আপন সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন খোদা তাকে ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বিশ্বমানবতার মুক্তির একমাত্র সনদ ও বিধান আল ইসলাম আমাদের হাতে থাকার পরও আমরা তার সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে যতটুকু গাফলতি প্রদর্শন করছি এবং ইসলামের বিপরীত সাক্ষ্যদানে যতখানি তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছি, ঠিক ততটাই আমরা অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশের সমাজ জীবন

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা কী? আল্লাহর দ্বীন এখানে কী অবস্থায় আছে তারও একটু পর্যালোচনা করা দরকার। উল্লেখ্য, ঈসায়ী সপ্তম শতাব্দীতেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। হযরত শাহজালাল রহ., শাহ মাখদুম রহ. ও খান জাহান আলী রহ. প্রমুখ পুণ্যাত্মা পুরুষের সাধনা এবং প্রচেষ্টা এ অঞ্চলে তাওহীদের প্রসার লাভের পেছনে কাজ করেছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ সহজ-সরল এবং ধর্মভীরু। তাদের চেতনার মর্মমূলে তাওহীদের প্রেরণাই ক্রিয়াশীল। দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনিতেই তাদের প্রতিদিনের ঘুম ভাঙে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রেও তারা অন্য যে কোনো মুসলিম দেশের তুলনায় অগ্রসর।

তথাপি একথা সত্য যে, এদেশের মানুষ কোনোদিনই ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়নি। এখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়ন কখনো হয়নি। এখানে মুসলিম শাসন কায়েম হলেও তা ছিল ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর শাসন। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নে সে সব শাসক কখনও তৎপর হয়নি। তাছাড়া পরাধীনতার গ্লানিও ভোগ করতে হয়েছে এদেশের মানুষকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বহু লড়াইয়ের পর ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। ইসলামের নামেই তা অর্জিত হয়েছিল। ফলে এদেশের মানুষ চেয়েছিল সেখানে একটি ইসলামী সমাজ তথা শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের মানুষের তথা উপমহাদেশের মুসলমানদের। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যারা এসেছিল তারা ছিল নামে মাত্র মুসলিম। কিন্তু বাস্তব কার্যকলাপে তারা ছিল খোদাদ্রোহী, জালিম এবং ফাসিক। তারা তাদের শাসন ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ইসলামের দোহাই দিতো, ইসলামকে ব্যবহার করতো। কিন্তু ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো চেষ্টাই তারা করেনি, উপরন্তু বাংলাদেশের মানুষের উপর চালালো জুলুম ও বে-ইনসাফী। বাংলাদেশের মুসলমানরা যে আশায় পাকিস্তান চেয়েছিল তাতো তারা পেলোই না-তার উপর আবার তারা হলো শোষণ, বঞ্চনা ও জুলুমের শিকার। তাই বাংলাদেশের মানুষ শুরু করলো স্বাধিকারের সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে লক্ষ লক্ষ মানুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

কিন্তু স্বাধীনতার পরের ইতিহাসও নির্মম এবং বেদনাদায়কভাবেই এগিয়ে যায়। অর্থনৈতিক দুর্ভোগ, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার আর ধর্মনিরপেক্ষতার জোয়াল এ জাতির কাঁধের উপর চেপে বসে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সংবিধান থেকে গণধিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাকে উচ্ছেদ করা হয়। বর্তমানে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবারও তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তবে খোদাদ্রোহী মতবাদের বাড়াবাড়ি, ব্যক্তি ও দল বিশেষের উচ্চাভিলাষ, স্বার্থের হানাহানি দেশকে বারবার ঠেলে দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা আজও বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। বর্তমানে দেশের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মানুষ দরিদ্র। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটছে তাদের জীবন। একবেলা খেয়ে না খেয়ে কোনো মতে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে প্রায় অর্ধেক মানুষ। খাদ্য নিয়ে ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ির চিত্রও এ সমাজে দৃশ্যমান। লক্ষ লক্ষ লোকের একটু মাথা গোঁজার মতো জায়গাও নেই। বৃষ্টি বাদল, ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাদের কোনো আশ্রয় নেই। একটুখানি আশ্রয়ের খোঁজে তারা এখান থেকে ওখানে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়ায়। আশ্রয় না পেয়ে খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটায়। অথচ তার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে তাদেরই রক্ত শোষণ করা পয়সা দিয়ে গড়ে উঠছে শহর-নগরীর আলীশান অট্টালিকাসমূহ এবং বালাখানাসদৃশ বাড়িসমূহ, যেখানে মুষ্টিমেয় ধনপতি ও সমাজের সুবিধাভোগী লোকেরা ভোগবিলাসে জীবন কাটায়। সমাজে শোষণমূলক অর্থব্যবস্থা চালু থাকায় এই সামাজিক বৈষম্য দিন-দিন কেবল বাড়ছেই। বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এখানে হয়েছে। কিন্তু এ সামাজিক জুলুম, শোষণ ও বৈষম্যের কোনো প্রতিকার হয়নি আদৌ।

বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও চলছে নৈরাজ্য। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা আজ আর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের ন্যূনতম প্রতিস্থাপন ঘটেনি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায়। স্বয়ং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র সংগঠনগুলোর আধিপত্যবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা। এ শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক উপহার দেয়ার পরিবর্তে করছে হতাশ ও বিভ্রান্ত। বস্তুত জাহিলী শিক্ষাব্যবস্থার এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। জাতীয় জীবনে এ কারণেই সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ধূর্ত, কপট, খেয়ানতকারী এবং ভণ্ড লোকেরাই নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সকল আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। শাসনের নামে জনসাধারণের উপর তারা চালাচ্ছে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ এবং জুলুম। মজলুমের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হলেও ক্ষমতায় আসীন ঐ সব জালিমের হৃদয় তাতে বিন্দুমাত্র দুর্বল হয় না। জনসাধারণের রক্ত চুষে নিয়ে যে সম্পদ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে

জমা করা হয় ঐসব খোদাদ্রোহী জালিম এবং ফাসিকরা সে সব সম্পদেরই অপচয় করে নিজেদের বিলাসী জীবন ও খেয়ালখুশি চরিতার্থ করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতির নামে বাংলাদেশে আজ পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ দাসত্ব চলছে অবিরাম। জনসাধারণের কষ্টার্জিত পয়সায় পরিচালিত জাতীয় প্রচার মাধ্যম বেতার ও টেলিভিশনকে এ কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে ভারতীয় নগ্ন সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বিয়ে বিহির্ভূত প্রেম-প্রণয়, পরকীয়া, হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্নতাসহ প্রভৃতি অসংখ্য ব্যধিতে আক্রান্ত আজ উঠতি বয়সী থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী সকল শ্রেণীর মানুষ। এদেশীয় স্যাটেলাইট টিভি, এফএম রেডিও, প্রিন্ট মিডিয়াসমূহের গুটিকয়েক বাদে বাকী সবগুলোই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সত্য ও গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশনা এবং দল নিরপেক্ষতা হারিয়েছে বহুদিন যাবৎ। অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ প্রভৃতি হরদম ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও নাস্তিকতা প্রসারের কাজে। ফেনসিডিল, ইয়াবা, ইন্টারনেট ও মোবাইল পর্নোগ্রাফি প্রভৃতির ধ্বংসাত্মক আসক্তির শিকার আজ উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণী। তার উপর রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, পার্ক, ক্লাব ও বার, ফ্যাশন শো ও ফিল্ম প্রদর্শনী, রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ক্রমবর্ধমান নির্লজ্জতার প্রদর্শনী, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও বিকৃত রুচির ছায়াছবি ইত্যাদি। যে কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ, ব্যাভিচার, লিভ টুগেদার, আত্মহত্যার মত প্রভৃতি সামাজিক অবক্ষয় এখানে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এক কথায় জাতীয় জীবনে আজ সামাজিক ব্যাধির সকল উৎস খুলে দেয়া হয়েছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই জাহিলিয়াত পুরোদমে কর্তৃত্বশীল হয়ে বসেছে। সমাজ জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের অবশিষ্টাংশটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। হত্যা, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এটা আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি জাহিলী সমাজের বাস্তব প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর দ্বীন এখানে পদে পদে ভূলুণ্ঠিত। কুফুরি আইন-কানুন এখানে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোনো জোড়াতালি

দিয়ে কিংবা স্থূল সংস্কারের মাধ্যমে এর পরিবর্তন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ বিপ্লবের। যে বিপ্লবের স্রোতের সাথে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাবে জাহিলিয়াতের সমস্ত জঞ্জাল ও আবর্জনা, আল্লাহর দ্বীন এখানে বাস্তব অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ ইসলামের মহান আদর্শে পুনর্গঠিত হবে-পরিচালিত হবে এবং মজলুম মানুষের ভাগ্যে জুটবে তাদের পরম প্রত্যাশিত মুক্তি।

ইসলামী ছাত্র মজলিসের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়াস

আল্লাহর এই জমিনে সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন এবং জাহিলিয়াতের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে আল-কোরআন ও আল হাদিসের আলোকে আমাদের জীবনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস সাধনের মাধ্যমে একটি সার্থক ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা এবং পরকালীন নাজাতের উদ্দেশ্যেই ১৯৯০ সালের ৫ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস। ইসলামী ছাত্র মজলিসের প্রতিষ্ঠা তাই আমাদের প্রত্যাশারই বাস্তব প্রতিফলন। বস্তুত লক্ষ্যবিস্মৃত মানবতার সত্যিকার কল্যাণ ও মুক্তির পথ নির্দেশের জন্যে যে দায়িত্ব মুসলিম মিল্লাতের উপর অর্পিত হয়েছে বর্তমান অবস্থার দাবি অনুযায়ী ইসলামী ছাত্র মজলিস সে কর্তব্য পালনের জন্যেই এগিয়ে এসেছে। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ পৃথিবীর মানুষকে যে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন ইসলামী ছাত্র মজলিস সেই একই দাওয়াত নিয়ে ছাত্র সমাজের মাঝে কাজ করছে। ছাত্র মজলিসের সংবিধানে এ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবনের পরিশুদ্ধি, সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ লাভ এবং এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর সন্তোষ ও পরকালীন মুক্তি অর্জন।

মৌল কর্মনীতি

সার্বিক বিষয়ে আল-কোরআন, রাসূল স.-এর সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ।

কর্মসূচি

দাওয়াত: ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, তাদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানার্জনে উৎসাহ সৃষ্টি এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

সংগঠন: যে সব ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে অংশ নিতে আগ্রহী তাদেরকে এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রশিক্ষণ: এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান, সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ।

আন্দোলন: ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন এবং শোষণ, জুলুম, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় থেকে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে জনমত গঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

মোটকথা ইসলামী ছাত্র মজলিস চায় বাংলাদেশের এই জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। একটি পরিপূর্ণ সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে সকল তাগুতী, খোদাদ্রোহী এবং জাহিলী শক্তিকে উৎখাত করে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এর সমস্ত প্রয়াস এবং সাধনা। ইসলামী ছাত্র মজলিস তাই প্রচলিত অর্থে তথাকথিত কোনো ছাত্র সংগঠনের নাম নয়। বরং এটি একটি দ্বীনি কাফেলা, একটি দ্বীনি আন্দোলন।

ছাত্র মজলিস মনে করে অনৈক্য ও বিভ্রান্তিই এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ছাত্র মজলিস বিশ্বাস করে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এবং জাহিলিয়াতের প্রভাবমুক্ত সকল মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ব্যাপকভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই এ জমিনে দ্বীন কায়েমের আন্দোলন সফল হতে পারে। তাই এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে ছাত্র মজলিস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বস্তুত দেড় হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের

ইতিহাসে ইসলামী ছাত্র মজলিস বাংলাদেশের সবুজ অংগনে এক অনন্য সংযোজন। ছাত্র মজলিস মজলুম মানবতার একান্ত আপনজন।

তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছো না কেন? অথচ নির্যাতিত নারী-পুরুষ এবং শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, হে প্রভু, জালিম অত্যাচারীদের এ জনপদ থেকে আমাদের মুক্ত করো এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও-(সূরা নিসা: ৭৫)।

আল কোরআনে আল্লাহপাকের এ ঘোষণা অনুযায়ী সমাজের দীন-দুঃখী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও মজলুম তথা মুস্তাদআফীনদের (নিগৃহীত) মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম চালানোকে ছাত্র মজলিস অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তৌহিদী দীক্ষায় দীক্ষিত একটি মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলা, ইনসাফপূর্ণ তথা শোষণমুক্ত একটি সমাজ কায়েম করা এবং আখিরাতমুখী একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়াই ছাত্র মজলিসের স্বপ্ন ও প্রয়াস।

তাই ছাত্র মজলিস সব সময় আহ্বান জানায় চির সত্যের পথে, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের আদর্শের পথে, প্রকৃত মুক্তির পথে।

-ঃ আমাদের দাওয়াত ঃ-

দল-মত নির্বিশেষে সকলের কাছে আমরা ইসলামের সেই শাশ্বত সুন্দর মূল দাওয়াতই পেশ করতে চাই

আসুন, আল্লাহর দ্বীনকে জানা ও বোঝার জন্যে আমরা তৎপর হই। আসুন, আমরা সকল প্রকার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব গ্রহণ করি। সর্বপ্রকার মত, পথ ও বিধান ত্যাগ করে একমাত্র রাসূল স.-এর আদর্শ জীবন ও পদাংক অনুসরণ করি। আর আমাদের এ আনুগত্য ও অনুসরণ যেন জীবনের কোনো একটি বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে বরং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত হয়।

আসুন, আমরা আমাদের জীবন ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলি এবং সত্যের সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াই। মানব-সমাজকে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূল স.-এর দিকে ডাকি।

আসুন, আমরা সংঘবদ্ধ হই। কেননা, আল্লাহপাক স্বয়ং আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর পথে লড়াই করতে আহ্বান জানিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা সফে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন- আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে লড়াই করে এমনভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর। (আয়াত:৪)

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন- আল্লাহ পাক আমাকে যে পাঁচটি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন আমিও তোমাদেরকে তারই হুকুম দিচ্ছি। তা হলো, জামায়াত (সংঘবদ্ধতা) কায়েম, নেতার আদেশ শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ-(হারেম আল আশয়ারি তিরমিযি)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে অনেকেই ইসলামের সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। ফলে সংগঠনের কথা শুনলেই তারা

এটাকে নিছক দুনিয়াবি ব্যাপার এবং অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত কাজকর্ম বলে মনে করেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, নামায-রোযা করলেই তো হলো, এসবের আবার দরকার কী? বস্তুত এটা যে কতো বড় মারাত্মক অজ্ঞতা এবং জাহিলী চিন্তা তা কোরআন ও হাদিসের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি হতেই সুস্পষ্ট।

আসলে একাকী ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ইসলামের দাবি পূর্ণরূপে পালন মোটেই সম্ভব হয় না। ব্যক্তি জীবনের সাথে দ্বীনের এক সামান্য অংশেরই সম্পর্ক রয়েছে মাত্র। সেটুকু সে পালন করে ফেললেও পূর্ণ দ্বীন কায়েম হয়ে যায় না এবং এতে তার সত্যের সাক্ষ্য আদায় হয় না। তাছাড়া সমাজ জীবনে কুফুরি ও জাহিলী ব্যবস্থা প্রাধান্য থাকলে ব্যক্তি জীবনেরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামকে সীমিত ও সংকুচিত করতে থাকে। যেমনটি আজকের সমাজেও হচ্ছে। কাজেই ইসলামের উপর পূর্ণরূপে টিকে থাকতে হলে, নিজের চারপাশে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং দ্বীন কায়েমের চেষ্টা চালাতে হলে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। হযরত ওমর রা. এজন্যেই বলেছেন যে- 'লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াত' অর্থাৎ সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলামের কোনো অস্তিত্ব নেই।

আমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নাফরমানি এবং বিদ্রোহের আচরণে লিপ্ত কিংবা আমরা যারা প্রতিদিন গুনাহের পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছি, তাদের প্রতি আমাদের আকুল আহ্বান আসুন, এই দুনিয়ায় আমাদের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের ব্যাপারে আমরা সচেতন হই। অতি অল্প সময়ে নিঃশেষিত পার্থিব জীবনের এই স্বাদ-আস্বাদের কিইবা মূল্য আছে সেই চিরন্তন আজাবের বিনিময়ে, যার কোনো সীমা নেই, শেষ নেই। দুনিয়া পূজারীদের জন্য এই যে প্রতিশ্রুত জাহান্নাম অশেষ ও চিরন্তন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোনো সন্দেহ আছে? আমরা কেউই তো আখিরাতের সেই সঠিক ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করার যোগ্যতা ও সাহস রাখি না।

সুতরাং কোনো রকম বিলম্ব ছাড়াই সতর্কতার সাথে আমাদের পথ চলা শুরু করা দরকার। যেদিন ভাই তার আপন ভাই থেকে দৌড়ে পালাবে, পিতা-মাতা সন্তান পরস্পরকে ছেড়ে যাবে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউই পরিচয় পর্যন্ত দিতে রাজী

হবে না; সেদিনের অসহায়ত্ব ও একাকিত্বের কথা চিন্তা করে এখনই হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ পাকের নির্দেশকেই মেনে নিতে হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন- হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আজাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স. প্রতি দৃঢ় ঈমান আনয়ন করো এবং তাঁর পথে সংগ্রাম করো জান ও মাল দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পারো। আল্লাহ তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ হতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত এবং সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা সফ:১০-১২)

বস্তুত জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে এ পৃথিবীতে আমাদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমাদের সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে।

আল্লাহপাক কোরআনে অন্যত্র বলেছেন- 'মুমিনদের জান ও মাল আল্লাহ পাক জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন (তাওবা: ১১১)'। অর্থাৎ নাযাত পেতে হলে তথা জান্নাত লাভ করতে হলে এই দুনিয়ায় নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে জিহাদে অংশগ্রহণ করেই নি; এমন কী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্যে নিজের মনে কোনো বাসনাও পোষণ করেনি তার মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু। (মুসলিম শরীফ)

সুতরাং আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে (অর্থাৎ একমাত্র দ্বীনের কাজে) অংশগ্রহণ করতেই হবে।

তাই আমাদের আহ্বান- আসুন, আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক প্রচেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের সমস্ত ত্যাগ ও কোরবানি একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করি যেন পৃথিবীর বুকে আল্লাহর বাণী সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে; রাসূলের স. আনীত বিধান পৃথিবীর বুকে সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, শোষণ এবং জুলুমের অবসান হয় এবং মানব জাতি ইসলামের ভিত্তিতে তাদের সামগ্রিক জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সমাপ্ত